খেলাপাতুনি

সুকুমার রুজ

সত্যিই জীবনটা কেমন যেন খেলা-খেলা হয়ে গেল! মেয়েবেলায় খেলাঘর পাততাম পাশের বাড়ির রাতুলের সঙ্গে। কিন্তু নারীবেলায় জীবনের খেলাঘর ওর সঙ্গে আর পাতা হয়ে উঠল না। ওর ঘরের দখল নিল অন্য নারী, আর আমি....।

আর কিছুক্ষণ পর আমাকে খেলায় নামতে হবে। বাঘবন্দি খেলা। হ্যাঁ, এখন বাঘকে বন্দি করা-ই আমার কাজ। কাজ নাকি খেলা, ঠিক বুঝি না। হয়তো খেলানোটাই কাজ। কানোরিয়া, কাপুর, বনশল, খান্ডেলওয়ালদের খেলিয়ে খেলিয়ে ওদের ভেতরের বাঘটাকে বন্দি করে ফেলতে পারলেই...।

না, না আমি খেলাতে চাই না, খেলতেও চাই না। আমাকে খেলানো হয়। কারণ, আমি যে এখন তমস্বানের খেলার পুতুল। হ্যাঁ, পুতুল নয় তো কী! শুধু হুকুম তামিল করে যাই, কেন-না, আমি যে তমস্বানের খেলাপাতুনি বউ!

মেয়েবেলায় খেলাপাতুনি বউ হতাম। রাতুল হত আমার বর। রাতুলের বোন অলক্তিকা হত আমাদের মেয়ে। আমাদেরকে 'বর-বউ' খেলতে দেখে রাতুলের পিসি বলত, 'ওরে বিভা! এখন খেলাঘরের বউ সাজছিস; বড়ো হলে সত্যিকারের বউ হবি। তখন তোর ঘরকন্নার কত কাজ করতে হবে তোকে। এখন থেকে সে সব কাজ অভ্যেস কর।'

আমি কাজে ডুবে যেতাম। খেলাঘর ঝাঁটপাট দিয়ে সাফসুতরো করে, ধুলোর ভাত রাঁধতাম। খোলামকুচির মাংসের ঝোল রাঁধতাম। কাল্পনিক-সকালবেলায় রাতুলকে 'ওগো-হ্যাঁগো' করে ডেকে, জলকাদার চা তৈরি করে নারকেল-মালায় ঢেলে, রাতুলের দিকে বাড়িয়ে দিতাম। রাতুল পরম তৃপ্তি সহকারে মিছিমিছি চুমুক দিয়ে বলত, 'চিনি বেশি কেন?'

এখনকার খেলাতেও আমাকে চুমুক দেওয়ার সামগ্রী বাড়িয়ে দিতে হয়। শুধু আমার বরকে নয়; ওইসব বর্বর কানোরিয়া, কাপুর, বনশলকেও। মিছিমিছি নয়, ওরা সত্যি সত্যি চুমুক দেয়। সে চুমুকে ওদের চোখে ঘোর লাগে, মনে রং ধরে। তখন ওরা আমাকে কাছে টানতে চয়, আদর করতে চায়। আসলে আদর নয় ওদের ভেতরের বাঘটা থাবল দিয়ে আমার মাংস খেতে চায়।

মনে পড়ে—ছোটোবেলায় রাতুলও আমাকে আদর করত। অন্যরকম আদর। ওর বাবার দেখে লুকিয়ে শিখেছিল। একদিন সকালবেলায় ঘুম ভাঙতেই রাতুল দেখেছিল—ওর মা চায়ের কাপ টিপয়ে নামিয়ে রাখতেই ওর বাবা, মাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করছে।

আমার দেওয়া জলকাদার চা নামিয়ে রেখে আমাকে রাতুলও সেরকম আদর করত। সুড়সুড়ি লাগত আমার গালে। আমি খিলখিলিয়ে হেসে উঠতাম। তখন আমাদের খেলাপাতুনি মেয়ে অলক্তিকা খড়ের বিছানায় শুয়ে চোখ পিট্‌পিট্ করে বলত, 'দাদা! তুই শুধু বিভাকেই আদর করছিস্! আমাকে করছিস্ না?'

রাতুল ওকে ধমক দিয়ে বলত, 'যাঃ! তুই তো আমাদের মেয়ে। তুই দুষ্টুমি করলে তোকে শাসন করতে হয়। দেখিস না, মা-বাবা আমাদের কেমন শাসন করে।'

অলু তখন ভেংচি কেটে বলত, 'হুঁ! শাসন করতে হয়। যা, আমি আর মেয়ে হব না, এবার তোর বউ হব।'

রাতুল দুম করে বোনের পিঠে কিল বসিয়ে দিত—যাঃ! বউ হতে এসেছে! বিভা ছাড়া আর কেউ আমার বউ হবে না। তুই তো বোন! বোন কখনও বউ হয়। পিসি কি বাবার বউ?

অলক্তিকা মেয়েবেলায় খেলাপাতুনি বউ হতে চেয়ে মার খেয়েছিল। আর আমি.....। এই তো সেদিন বউবেলায় বউ হতে চেয়ে তমস্বানের হাতে মার খেলাম। না শুধু একটা কিল নয়; কিল-চড় ঘুসি, চুলের মুঠি ধরে তলপেটে লাথি। আমার অপরাধ এই—আমি বলেছিলাম, 'শুধু তোমার বউ হয়ে থাকতে চাই। খারাপ মেয়েমানুষ হতে পারব না।'

তমস্বান হিস্‌হিসে গলায় বলে উঠেছিল, 'তুই আমার বউ হওয়ার যোগ্য নোস্। তোর সেই রাতুলের কথা কিছু জানি না ভেবেছিস। দয়া করে তোকে বিয়ে করেছি। তুই আমার কেনা বাঁদি। যা করতে বলব তাই করবি।

উলটোদিকের ফ্ল্যাটেও দত্তগিন্নি একদিন বলেছিল, 'পড়ে পড়ে মার খাও কেন? খচ্চরটাকে কাঁচকলা দেখিয়ে চলে যেতে পারো না? ওরকম অমানুষ স্বামীর 'ঘর' করার কী দরকার। দেশে কি পুরুষমানুষের অভাব আছে।'

কথাটা যে আমার মনে ধরেনি তা নয়। কিন্তু যাবটা কোথায়? রাতুল তো অন্য একজনকে বিয়ে করে অন্য জায়গায় ঘর সংসার পেতেছে। পোড়ো বাড়িতে বিধবা মা, আর অন্য পাড়ায় বউকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া দাদা, এই তো আমার বাপের বাড়ি। বাপ-ই নেই তো বাপের বাড়ি। বাবা যখন ছিল, তখন সে একদিন ছিল আমাদের। কত আনন্দ, কত মজা, কত আদর ভালোবাসা।

মনে পড়ে—তখন গরমকাল। আমাদের ছিল মার্নিং স্কুল। স্কুল থেকে ফিরে ইউনিফর্ম খুলতে যা দেরি। তারপর দে ছুট আমবাগানে। সেখানে অলক্তিকা, ওর পিসির গুঁড়ো করে দেওয়া নুন—লঙ্কা আর আধখানা ব্লেড নিয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছে। ওর কোঁচড়ে কচি আমের রাশি। আমগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে, ব্লেড দিয়ে বেজায় টক আমের কী অপূর্ব স্বাদ! একদিন ঘটল অঘটন। অসাবধানে ব্লেড বসে গেল। রক্ত থামতেই চায় না। অবশেষে অলক্তিকার তৎপরতায় বাবার কাছে খবর। বাবা এসে কোলে চড়িয়ে তড়িঘড়ি নিয়ে ডাক্তারখানা। মা যত না বকাবকি করল, কাঁদল তার চেয়ে বেশি। ডাক্তারখানা থেকে ফেরার পর বাবা গাছ থেকে কচি আম পাড়ল। ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়াল।

নুন মাখিয়ে আমার মুখে আমের কুচি পুরে দিতে দিতে বলল, 'আঙুলের ব্যথাটা কমেছে এবার?' তারপর চুলে আঙুল ডুবিয়ে, থুতনি ধরে সে কী আদর!

এমন পোড়াকপাল আমার, বিয়ে হতে-না-হতেই বাবার আদর হারালাম। মা-ও কী আর আগের মতো আদর করে। মায়ের কাছে গিয়ে একদিনের বেশি দু-দিন থাকলেই মা বলে—'খুকু! তুই কখন যাবি রে? জামাই আবার রাগ না করে।'

মা যে আমাকে ভালোবাসে না তা নয়, বরং বেশিই ভালোবাসে। তাই তো যাওয়ার কথা শুধোয়। মায়ের কাছে তো মাছ-মাংসের বালাই নেই, ভাতে-ভাত শাকপাতা। বড়ো জোর আলুপোস্ত। মা ভাবে মেয়ের খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে। ইচ্ছে থাকলেও মাছ-মাংস কেনার সামর্থ্য নেই মায়ের। মাকে দাদা টাকাকড়ি তেমন দেয় না। ইচ্ছা থাকলেও মাকে কিছু দিতে পারি না।

দাদা-বউদির কাছেও আমার জায়গা হবে না। মাকেই যে রাখে না, স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা বোনকে সে রাখবে! মায়ের কাছে ওই পোড়োবাড়িতে বরাবরের জন্যে চলে আসা আর জঙ্গলে বাস করা এক ব্যাপার। ওখানে কানোরিয়া-কাপুর-বনশলদের মতো বাঘ না থাকলেও, শেয়াল-কুকুরের অভাব নেই। সুযোগ পেলেই কে কখন খ্যাঁক করে কামড় বসাবে। স্বামীছাড়া, কমবয়সি নারী, আর জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া ধাড়ি-ছাগল প্রায় এক গোত্রের।

বিয়ের আগে থেকেই দেখতাম কতজনের চোখে লোভের আগুন আর মুখে লালা। খেয়ে, না খেয়ে আমার শরীরটাও আগুনের শিখা হয়ে রয়েছে। এত মার খাই তবুও....। এমন শরীর জন্তু-জানোয়ারের চোখে তো পড়বেই। তাই দত্তগিন্নির পরামর্শমতো পালিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই।

ফ্ল্যাটবাড়ির ঠিকে কাজের মেয়েটা একদিন চুপিচুপি বলল, দেশে কি আইন-কানুন নেই? সোজা থানায় চলে যাও না বউদি! বধূ-নির্যাতনের কেস লেখাও। বাছাধন তখন টের পাবে। বছর পাঁচেক জেলের ঘানি টেনে আসুক। বউকে দিয়ে খারাপ কাজ করানোর মজা বুঝবে তখন। এখন আইন তো মহিলাদের পক্ষেই।'

বেচারি মেয়েটাকে কে বোঝাবে আইন তাদের পক্ষেই; যাদের টাকা আছে। আমার টাকা কোথায়! তাছাড়া থানার গিয়েও কোনো লাভ নেই। লুকোনো মুভিক্যামেরায় বিছানা-দৃশ্যের নোংরা ছবি তুলে রেখেছে গুণধর স্বামী। একদিন সেই ভিডিয়ো দেখিয়ে শাসিয়েছে—বেশি ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করলে, তোকে ফাঁসাতে বেশিক্ষণ লাগবে না। পুলিশ ছবিকেই গুরুত্ব দেবে, মুখের কথাকে নয়।

আমার গুণধর স্বামীর কথা অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা জানে না তা নয়, তবে সবাই গা বাঁচিয়ে চলে। আজকাল কে আর পরের ঝামেলায় মাথা ঘামায়। তবুও দু-একজন পরামর্শ দিয়েছে, মহিলা সমিতি কিংবা নারী কল্যাণ সমিতিতে গিয়ে সবকিছু জানাতে।

একদিন চুপিচুপি মহিলা সমিতিতে গিয়েছিলাম। সব শুনে নেত্রী-স্থানীয়া একজন বলল—আজ বিকেলে তো আমাদের মিছিল আছে। চারটে নাগাদ মিছিলে চলে আসুন।

তখন আরও কথা হবে। আর দু-চারদিনের মধ্যে দেখছি আপনার কেসটার কদ্দুর কী করা যায়।

বিকেলে আমার আর যাওয়া হয়নি। কারণ আমার পতিদেবতাটি বিকেলেই ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছেন। উনি এসব জানতে পারলে.....। 'পতিদেবতা' কথাটি মায়ের মুখে শোনা। মা বলেন—'পতি, অর্থাৎ স্বামী হল স্ত্রীদের কাছে দেবতা।'

মেয়েবেলা থেকে দেবতা সম্পর্কে অন্যরকম ধারণা ছিল। এই বউবেলায় বুঝলাম 'দেবতা কী জিনিস! ও দেবতাটিকে বাবা কত কষ্ট করেই না জোগাড় করেছিল। ঘটক লাগিয়ে দু-দশখানা গ্রাম-শহর ঢুঁড়ে বাপের 'সবেধন-নীলমণি' ওই বিল্ডিং-মেটিরিয়ালের ব্যবসাদারের সন্ধান পাওয়া গেল। গণ, রাশি গোত্র মিলিয়ে কোষ্ঠীবিচার করে জ্যোতিষার্ণবের গণনায় আমরা হলাম রাজযোটক। সত্যিই আমি রানির হালেই দিন কাটাচ্ছি। তবে কিনা দুয়োরানি।

আমার বিয়ের আগে বাবা বলত, 'প্রেম করে বিয়ে মোটেও টেকে না। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই প্রেমের পালিশ উঠে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়। তাছাড়া প্রেম করা মানেই বেলেল্লাপনা। খবরদার ও পথ মাড়াবে না। এখন তুমি বড় হয়েছ। ওই রাতুলটার সঙ্গে তোমাকে যেন কক্ষনো না দেখি! তোমার জন্য আমি ভালো পাত্র খুঁজব।' বাবা রাতুলের কথা তুলতে আমার মনে হয়—আচ্ছা! রাতুল কি আমার প্রেমিক! নাকি খেলার সাথি! নাকি অন্যকিছু।

মাকে খবরের কাগজের 'পাত্রী চাই' বিভাগে চোখ বুলোতে দেখলে বাবা বলত, 'ধূস! কাগজের বিজ্ঞাপনে কখনও ভালো পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাকি? যারা অযোগ্য, যাদের পাত্রী জোটে না, তারাই কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়।

অথচ অলক্তিকার বিয়ে হল রবিবাসরীয়র 'পাত্রী চাই' কলম থেকে পাত্রের সন্ধান পেয়ে। অলক্তিকা রানির হালে না-থাকলেও, ওর কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার স্বামী নিয়ে বেঙ্গালুরুতে সুখে ঘর-সংসার করছে। মাঝে মাঝে ফোন করে। তখন ওর গলায় যেন খুশি উথলে ওঠে। ও যে কত সুখে আছে তা বোঝাতে কত গল্পই না করে। আমিও বানিয়ে বানিয়ে আমার দারুণ সুখের কথা বলি। গলায় খুশি আনার চেষ্টা করি। তখন বুকের ভেতরে রক্তক্ষরণ হয়। যখন বুঝি বুকের কষ্ট গলায় চলে আসছে, তখন ফোন ছেড়ে দিই। ও বন্ধু হলেও ওকে সব কথা বলতে পারি না। কেন না, ও রাতুলের বোন।

রাত নেমেছে। আর একটু পরেই আমার খেলা শুরু হবে। আজ সেই খ্যাঁকশিয়াল-মার্কা কানোরিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তমস্বান। ওর ফরমান—যেভাবেই হোক কানোরিয়াকে আজ খুশি করতে হবে। ওর নতুন প্রোজেক্ট 'রয়্যাল কম্‌পেক্স'-এর ভিত পুজো হয়ে গেছে। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই কাজ শুরু হবে। ওই প্রেজেক্ট-এর টোটাল ইট—বালি সিমেন্টের অর্ডারটা পেতেই হবে।

কানোরিয়ার সঙ্গে খেলার জন্য এখন আমি সাজতে বসেছি। পাশের ঘরে তমস্বান গ্লাস সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। তৃষ্ণার্ত অপেক্ষা। ডিপ-ফ্রিজের আইস-ট্রেতে জল ঢালা

ছিল না। তাই আমার গালে একটা চড় কষিয়ে, ট্রেতে জল ঢেলে অপেক্ষা করছে আইস-কিউবের জন্য। আমি আচমকা চড় খেয়ে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তা দেখে ঘাড়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল—সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এখুনি কানোরিয়া এসে যাবে। একটু সেজেগুজে নাও।

আমি সাজছি। দেহে এবং মনে সাজছি। আজ একটু অন্যরকম সাজ। কেন যে এতদিন এ-সাজ সাজিনি। আজ কেনই বা হঠাৎ এ সাজে সজ্জিত হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিলাম। রাতুলের দেওয়া সেদিনের অসাধারণ উপহারটাই কি আমাকে দেহে-মনে এমন বদলে দিল?

সেদিন রাতুলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তমস্বান ওর ব্যবসায় কাজে বীরভূম গিয়েছিল। সেই সুযোগে আমি গিয়েছিলাম মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। বাসস্টপে রাতুলের সঙ্গে মুখোমুখি। আমি ওর চোখ এড়াতে পারলাম না। সঙ্গে ওর স্ত্রী ও ছিল। আমাকে ডেকে নিয়ে, ওর বোনের বান্ধবী বলে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ওর স্ত্রীকে আমি প্রথম দেখলাম। বেশ হাসিখুশি। পুতুল-পুতুল গড়ন। পাশাপাশি বাড়ির পথে যেতে আমার সঙ্গে কত কথা বলল। রাতুলের এখন পোস্টিং পুনেতে। একমাসের ছুটি কাটাতে বাড়ি এসেছে। বাড়িতে একঘেয়েমি লাগছে। তাই এক সপ্তাহের ট্যুরে নেপাল গিয়েছিল; তখন ফিরছে।

বাড়িতে ঢোকার আগে রাতুলের বউ ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আমাকে একটা উপহার দিল। কাঠমাণ্ডুতে কেনা কাঠের তৈরি একটা ড্রাগনমুখী সিঁদুর কৌটো। খালি। সিঁদুর ভরে নিতে হবে। এ-কৌটো থেকে সিঁদুর পরলে নাকি অক্ষয় এয়ো-স্ত্রী থাকা যায়। রাতুল বলল 'তোর বউদি যখন তোকে গিফ্‌ট দিল, দাদা হয়ে আমারও তোকে একটা কিছু দেওয়া উচিত। কিন্তু এখন তো ব্যাগ খোলার অসুবিধা। তোর বাড়িতে এসে দিয়ে যাব। এখন চলি রে বিভা!'

যুবক হওয়ার পর রাতুল আমাকে কখনো 'তুই' বলেনি। সেদিন হঠাৎ 'তুই' সম্বোধন করে, দাদা বনে গিয়ে, আমার অনেকখানি মুশকিল আসান হয়েছিল।

সেদিন বিকেলেই আমাদের পোড়ো বাড়িতে এসেছিল রাতুল। আমার ছেলেবেলার প্রেমিক; প্রেমিক কেন খেলাপাতুনি বর। সে আমার জন্য উপহার নিয়ে এসেছিল। এক অভিনব উপহার। ওটা নাকি নেপালিদের কাছে পবিত্র ও ধর্মীয় জিনিস। এক জোড়া কিনেছে। একটা নিজের জন্য রেখেছে একখানা আমাকে দিল।

রাতুল চলে যাওয়ার পর জিনিসটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না ওটা নিয়ে আমি কী করব! শুধু কী ঘর সাজানোর জন্যই দিল, নাকি অন্যকিছুর জন্য। রাতুলের এ কেমনতর খামখেয়ালিপনা! আজ চোখের জল মুছতে মুছতে ড্রেসিংটেবিলের দেরাজ টানতেই চোখে পড়ল রাতুলের আর ওর বউয়ের দেওয়া উপহার দুটো। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এসে গেল এই নতুন সাজের কথা। সেদিন কী মনে করে ফেরার পথে এক-কৌটো সিঁদুর কিনে ড্রাগনমুখী কৌটোয় ঢেলে রেখেছিলাম। সচরাচর আমি সিঁদুর পরি না। আজ সিঁথি ভরতি করে পরলাম। কপালে বড়ো করে সিঁদুরের টিপ। ঠোঁট ভরতি

লিপস্টিক। গাছকোমর করে শাড়ি পরলাম। কোমরে আঁচলের তলায় গুঁজে দিলাম রাতুলের দেওয়া উপহার। এখন শুধু অপেক্ষা—কখন কানোরিয়া আসে।

ওই যে নীচে গাড়ির শব্দ! বোধহয় কানোরিয়া এল। আর দেরি নয়। খুব তাড়াতাড়ি আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে শেষ খেলাটা প্রথম কার সঙ্গে শুরু করব। কানোরিয়ার সঙ্গে নাকি তমস্বানের সঙ্গে। নাকি শেষমেশ নিজের সঙ্গেই। ওই যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। কোমরে গোঁজা নেপালিদের পবিত্র ও ধর্মীয় জিনিস, চকচকে কুকরিখানায় শক্ত হাত রেখে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে রইলাম আমি। ❑